আঁতাত, প্রস্থান পথ, ব্রুট মেজরিটি, তারপর?

আহসান মোহাম্মদ

বাংলাদেশের রাজনীতির নিকট ভবিষ্যৎ যে অনেকটাই নির্ধারিত হয়ে গেছে তা বিগত কয়েকদিনের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবেঃ

১. একটি কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২৬ ডিসেম্বর পদত্যাগ করেন শিক্ষা ও সংস্কৃতি উপদেষ্টা আইয়ুব কাদেরী। বিষয়টি অনেকেই বিস্মিত করেছিল, কেননা, এ ধরণের চেয়ারে একবার বসলে ক্ষমতাশীনদের ইচ্ছা ছাড়া বেরিয়ে আসা যায় না। কিন্তু কয়েকদিন পর যখন আরও চারজন উপদেষ্টাকে স্বেচ্ছায় পদচ্যূত করা হল, তখন বোঝা গেল তাঁর পদত্যাগে ক্ষমতাশীনদের সায় ছিল। আইয়ুব কাদরী তাঁর স্বাধীনচেতা স্বভাব ও চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য সুপরিচিত। তাঁর চাকুরী জীবনে তিনি এমন অনেক কাজ করেছেন যা বাংলাদেশের সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য ভাবা যায় না। সিদ্ধান্ত নেবার সময় ক্ষমতাশীনদের তদ্বির অগ্রাহ্য করার কারণে বারবার তাকে এক মন্ত্রণালয় থেকে অপর মন্ত্রণালয়ে বদলি করা হয়েছে। জোট সরকারের প্রথম দিকে তাঁকে ইআরডি সচিব নিয়োগ দেয়া হয়। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এডিবি, আইএমএফ ও অন্যান্য ঋণদাতা সংস্থা এবং দূতাবাসের কর্মকর্তারা সংশ্লিষ্ট ডেস্ক অগ্রাহ্য করে সরাসরি সচিবের সাথে দেখা করেন যা প্রটোকল সম্মত নয়। সংস্থাগুলোর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ও রাষ্ট্রদূতগণের পদমর্যাদা একজন জয়েন্ট সেক্রেটারীর। প্রোটোকল অনুযায়ী তাদের সংশ্লিষ্ট জয়েন্ট সেক্রেটারীর সাথে সাক্ষাৎ করার কথা। তিনি বিষয়টি জানিয়ে ঋণদাতা সংস্থা ও দূতাবাসগুলোকে চিঠি দেন। এতে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তাঁকে দ্রুত ইআরডি থেকে প্রত্যাহার করা হয়। এরপর এক পর্যায়ে তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসাবে যোগদান করেন। তখন কৃষি সচিব ছিলেন মতিউর রহমান নিজামী। নিজামীকে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে দেয়া হলে মন্ত্রীর বিদায় অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর দীর্ঘ চাকুরী জীবনে নিজামীর মত ভালো মন্ত্রী তিনি দেখেননি। তাঁর বক্তব্য সে সময় ক্ষমতাশীনদেরকে ক্ষুব্ধ করেছিল। ক্ষমতাশীনদের ক্ষোভ উপক্ষো করে রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুতে অবস্থানকারী মন্ত্রীকে এ ধরণের সার্টিফিকেট দেয়ার ঘটনা যেমন বাংলাদেশে বিরল, তেমনি তা আইয়ুব কাদরীর চারিত্রিক দৃঢ়তারও প্রমাণ বহন করে।

আইয়ুব কাদরীর পদত্যাগের দুই সপ্তাহের মধ্যে ৮ জানুয়ারী একজন প্রভাবশালী উপদেষ্টা, যাকে সরকারের মুখপাত্র হিসাবে বিবেচনা করা হতো, তাকে সহ চারজনকে পদচ্যূত করা হয়। বেশ কিছুদিন ধরে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং দলটির সমর্থক মিডিয়া উক্ত উপদেষ্টার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল। দেখা যাচ্ছে, উপদেষ্টা পরিষদের সংস্কারের মাধ্যমে একদিকে যেমন স্বাধীনচেতা ব্যক্তিগণকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে, তেমনি তাদেরকেও বাদ দেয়া হয়েছে যারা আওয়ামী লীগের প্রতি অপেক্ষাকৃত কম সহানুভূতিশীল।

২. এর পরপরই শেখ হাসিনা তাঁর দলের নেতা-কর্মীদেরকে নির্দেশ দেন তাঁকে জেলে রেখেই নির্বাচনে যাবার প্রস্তুতি নেয়ার। তাঁর এই নির্দেশ এমন সময়ে আসে যখন দুই নেত্রীর মুক্তির দাবী জোরালোভাবে উত্থাপিত হচ্ছিল। ক্ষমতাশীনদের সাথে আঁতাতের বিষয়টি আলোচিত হতে থাকলে ১৩ জানুয়ারী আদালতে জেরার সময় তিনি বলেন, 'কোন মিলিটারী ডিক্টেটর ক্ষমতায় আসবে বা রাষ্ট্রপতি হবে তাতে আমি রাজি হইনি। রাজি হলে আমার এ অবস্থা হতো না। এ দেশে বারবার মিলিটারী ডিক্টেটর ক্ষমতায় এসেছে। আমি চাইনি কোনো মিলিটারী ডিক্টেটর ক্ষমতায় আসুক।'

মিলিটারী ডিক্টেটর এরশাদের ক্ষমতায় আসা এবং টিকে থাকার ব্যাপারে শেখ হাসিনার ভূমিকা কারো অজনা নয়, যেমন অজানা নয় এই সরকারের ক্ষমতায় আনার আওয়ামী লগের দাবী ও তার সকল কার্যক্রমকে বৈধতা দেবার বিষয়ে শেখ হাসিনার প্রকাশ্য অঙ্গীকারের বিষয়টি। নিছক হাস্যরস যোগানোর জন্য সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী কোর্টে উক্ত বক্তব্য দেননি। বরং এটি ছিল ক্ষমতাশীনদের সাথে তাঁর নতুন আঁতাত ধামাচাপা দেয়ার প্রচেষ্টা।

৩. এর পরদিনই আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দ্রুত নির্বাচন দাবী করা হয় এবং বলা হয় এই সরকার যদি আগামী বাজেট দেয় তাহলে আশি টাকা কেজি চাল খেতে হবে।

৪. কেয়ারটেকার সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও বিশ্বব্যাংকের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. আকবর আলী খান ও আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতিশীল অন্যান্য সুশীলগণ তারপর বলতে থাকেন যে, আগামী বাজেটের আগেই নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

৫. জানুয়ারীর চতুর্থ সপ্তাহে পত্রিকাগুলোতে খবর বের হয় যে, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, কৃষক লীগ, ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ ইত্যাদি সহযোগী ও অঙ্গ সংগঠনগুলো শেখ হাসিনাকে মুক্ত করার আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করার জন্য ভারপ্রাপ্ত সভাপতির নিকট লিখিত স্মারকলিপি দিলে তা নাকচ করে দেয়া হয় এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়।

নেত্রীকে জেলে রেখে এবং নির্ধারিত সময়ের আগে নির্বাচনের বিষয়ে আওযামী লীগের আগ্রহের কারণ বুঝতে আরও কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজনঃ

১. দেশের অর্থনীতি ও খাদ্য নিরাপত্তা ধ্বংস করে বাংলাদেশকে বিগত ৩২ বছরের কোন সময়ের তুলনায় অনেক বেশী বিদেশ নির্ভর, বিশেষ করে ভারত নির্ভর করার কাজটি যে বর্তমান সরকার সাফল্যের সাথে সম্পাদন করেছে তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এ পরিস্থিতিতে সরকার ও প্রশাসনযন্ত্রকে প্রভাবিত করা দেশটির জন্য সবথেকে বেশী সহজ।

২. সর্বশেষ সংসদ নির্বাচনে এককভাবে দুই-তৃতীয়াংশ আসন পাওয়া দলটিকে পুরোপুরি ছত্রভঙ্গ করার কাজটিও ইতোমধ্যে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে। দলটির নেত্রী ও উদীয়মান তরুণ সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিবসহ প্রথম সারির প্রায় সকল নেতাই কারাগারে। তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অসংখ্য অভিযোগ শতকণ্ঠে প্রচার করে দলটির নেতাকর্মীদের মনোবলও পুরোপুরি ভেঙে দেয়া হয়েছে। কেবলমাত্র যারা দলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পেরেছেন তারাই বাইরে রয়েছেন। হান্নান শাহের মত মাধ্যম সারির নেতাও যখন দলকে ধরে রাখার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন, তখন তাকেও জেলে পাঠানো হয়েছে। সাবেক সংসদ সদস্যগণেরও একই অবস্থা। অধিকাংশই হয় জেলে না হয় ফেরারী। বাকীরা গা বাঁচাতে বিভীষণের দলে। নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সংস্থা দলটিকে ভাঙ্গার ব্যাপারে প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছে।

৩. ইলেক্ট্রনিক ও পৃন্ট মিডিয়ার প্রধান অংশটি বরাবরই বিএনপি বিরোধী। কিন্তু, বর্তমানে একটি নীরব মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে বিএনপি নেতাদের মালিকানাধীন মিডিয়াও দলটির বিরুদ্ধে পাল্লা দিয়ে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

৪. বিএনপির পরীক্ষিত বন্ধু জামায়াতের অবস্থা, 'চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা'র। বিগত নির্বাচনসমূহ থেকে ভোটের একটি সরল সমীকরণ সকলে বুঝে গিয়েছিলেন। তা হচ্ছে, জামায়াতে ১৫ শতাংশের

মত একটি ভোট ব্যাংক রয়েছে যা কমবেশী সারাদেশে বিস্তৃত । পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার সুযোগে দলটি ভোট ব্যাংকের পরিধি আরও বাড়াতে পেরেছে বলেই অনেকের ধারণা। ফলে জামায়াতকে সঙ্গে পেলে আবারও বিএনপি নির্বাচনে বিজয়ী হতে পারে। তাছাড়া দলটির রয়েছে সুসংগঠিত, শক্তিশালী ও বিস্তৃত তৃণমূল সংগঠন। বিগত এক দশকে জামায়াতের নেতৃত্বে ব্যাপক গুণগত পরিবর্তন এসেছে। যেখানে নব্বই এর দশকে দলটির নেতৃত্বের অধিকাংশ ছিল ষাটোর্ধ এবং রাজপথের আন্দোলনের অভিজ্ঞতাহীন, সেখানে এখনকার সকল পর্যায়ের নেতৃত্বে রয়েছে অপেক্ষাকৃত তরুণেরা যারা স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনসহ ছাত্র রাজনীতির অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাসসমৃদ্ধ। ফলে রাজপথের আন্দোলনেও দলটি বিএনপির সহযাত্রী হলে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব। এ কারনে জোট সরকারের পুরো পাঁচ বছর ধরে চেষ্টা চলতে থাকে বিএনপি-জামায়াতের সম্পর্কে ফাটল ধরানোর।

দুর্নীতির অভিযোগে বিএনপির মত দলটিকে ঘায়েল করা না যাওয়ায় যুদ্ধাপরাধী থেরাপীর আশ্রয় নেয়া হয়। নির্বাচন কমিশন, প্রধান উপদেষ্টা, সেনা প্রধান সকলেই এই বিষয়টি নিয়ে এমনভাবে কথা বলেছেন যে, দলটিকে খুব শীঘ্যই নিষিদ্ধ করা হবে বা তার নেতাদেরকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানো হবে - এ ধরণের ধারণা তৈরী হচ্ছে। অপরদিকে অধিকাংশ পত্রিকা ও সকল টিভি চ্যানেল একযোগে দলটির বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে দলটির নেতা-কর্মীদের মনোবল হয়তো ভাঙবে না, কেননা, তারা এ ধরণের প্রতিকুল পরিস্থিতিতেই রাজনীতি করে অভ্যস্ত। কিন্তু, বিএনপি সমর্থকদের মধ্যে তাদের গ্রহণযোগ্যতা যথেষ্ঠ কমে যাবে এবং জোটবদ্ধ আন্দোলন বা নির্বাচনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। তাছাড়া যেহেতু দলটি জানে তার উপর চরম নির্যাতন নেমে আসলেও দেশে বা বিদেশে তার জন্য এক ফোটা চোখের জল ফেলারও কেউ থাকবে না, তাই তারাও কোন আন্দোলনের ঝুকি নিতে চাইবে না।

৫. দুই নেত্রীই জেলে বা দুইজনই মুক্ত থাকলে কার কত লাভ ক্ষতি সেই বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে। খালেদা জিয়াকে জেলে রেখে ছত্রভঙ্গ বিএনপিকে ঐক্যবদ্ধ করা কঠিন। নেতা-কর্মীদের মনোবলও ফেরানো সম্ভব হবে না। অপরদিকে শেখ হাসিনাকে জেলে রেখেও আওয়ামী লীগ ঐক্যবদ্ধ এবং সক্রিয় রয়েছে। আবার মুক্ত খালেদা মুক্ত হাসিনার থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী ও ক্যারিসমেটিক। খালেদা মুক্ত হলে পুরো হিসাব-নিকাশই পাল্টে যাবে। অর্থনীতি ও খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তত্বাবধায়ক সরকারের শোচনীয় ব্যর্থতা, দুর্নীতির মামলাগুলো প্রমাণ করতে না পারা, এ সরকারের সাথে বিভিন্ন সময়ে আওয়ামী লীগের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য আঁতাত ইত্যাদি কারণে খালেদা জেলের বাইরে আসতে পারলে খুব দ্রুত জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে যাবেন।

দেখা যাচ্ছে, সরকার ইতোমধ্যে এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে যার ফলে রেফারী শতভাগ নিরপেক্ষ থাকলেও এবং খেলার মাঠটি পুরোপুরি সমতল হলেও বিএনপিকে সহজেই ধরাশায়ী করা যাবে এবং এ অবস্থায় দুই নেত্রীকে জেলে রেখে নির্বাচন হলে তাতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোট দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হয়ে আসবে। ক্ষমতাশীনদের নিরাপদ প্রস্থানের জন্য তাদের পছন্দের দলটির সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন। প্রধান দুটি দল থেকে নেতা ভাগিয়ে নিয়ে নতুন দল গড়ার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর আওয়ামী লীগের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে সেই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব বলে তারা মনে করছেন - এ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক।

এখন দেখা যাক, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোট দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আগামী সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আসলে তার ফল কি হতে পারে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে সংসদীয় নির্বাচনে কোন দল ব্রুট মেজরিটি পেয়েছিল তিনবার - ১৯৭৩ সালে আওয়ামী লীগ ২৯৩ টি আসনে জয়ী হয়। ১৯৭৮ সালে বিএনপি ২০৭ আসন পায় এবং ২০০১ সালে বিএনপি জয়ী হয় ১৯৩টি আসনে যা জোটের আসনের সাথে যুক্ত হয়ে দাড়ায় ২১২ টিতে।

১৯৭৩ সালের ব্রুট মেজরিটি আওয়ামী লীগ ও পুরো দেশের জন্য চরম দুর্যোগ বয়ে এনেছিল।

১. শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের পুরোটাই ছিল গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম। অথচ, ব্রুট মেজরিটির জোরে তিনি ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী গণতন্ত্র হত্যা করে বাকশাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেদিন সংসদে উপস্থাপনের মাত্র আধা ঘন্টার মধ্যে কোন বিতর্ক ছাড়াই পাশ হলো চতুর্থ সংশোধনী। তৎকালীন রাষ্ট্রপতিকে সংসদে উপস্থিত থেকে তা স্বাক্ষর করতে হয়। রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগ করার সুযোগ না দিয়েই মুজিব তৎক্ষণাৎ রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ নেন। রাষ্ট্রপতির উপর নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধিকার ন্যস্ত করা হয়। বিধান করা হয়, রাষ্ট্রপতির কর্মকান্ডের কেনা কিছুই আদলতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। সকল রাজনৈতিক দল ভেঙ্গে দিয়ে একটি একক রাজনৈতিক দল গঠনের ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেয়া হয় প্রেসিডেন্টকে। আইন হয়, উক্ত দলের নাম, কর্মসূচি, সদস্যভূক্তি, সংগঠন, শৃঙ্খলা, অর্থ সংস্থান এবং কর্তব্য ও দায়িত্বভার সম্পর্কিত সকল বিষয় তাঁরই আদেশে নির্ধারিত হবে। শেখ মুজিব মত প্রকাশের সকল অধিকার কেড়ে নেন। সরকারের সরকারের নিয়ন্ত্রাধীন চারটি পত্রিকা বাদে সকল পত্রিকা নিষিদ্ধ করা হলো।

২. আইন করে গণতন্ত্র হত্যা করার আগেও রাজনৈতিক বিরোধীদের হত্যা আর নির্যাতনের যে নজীর সৃষ্টি করা হয়েছিল, তার তুলনা পাকিস্তান কিংবা বৃটিষ আমলেও পাওয়া যায় নি। সংসদে দাড়িয়ে সংসদ নেতা একজন বিরোধী রাজনীতিকের নাম ধরে বলতে পেরেছিলেন, ‘কোথায় আজ সিরাজ সিকদার’। সংসদ নেতার নিজের বাহিনীই সিরাজ সিকদারকে হত্যা করেছিল। জাসদ এবং ছাত্র ইউনিয়নের হাজার হাজার কর্মীকে সে সময় গোপনে ও প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়।

৩. আওয়ামী লীগকেও কার্যতঃ নিস্ক্রিয় করে ফেলা হয় এবং দলের নেতৃত্ব নিয়ে আসা হয় মুজিব পরিবারের হাতে।

১৯৭৭ সালের নির্বাচনে বিএনপি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। সেই মেজরিটিকে ব্যবহার করা হযেছিল সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি সেকুলারিজমকে ‘আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা’ দিয়ে প্রতিস্থাপনে। বিষয়টি সমালোচিত হলেও তাতে যে জনমতের প্রতিফলন ঘটেছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তা না হলে আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ইশতেহারে ‘আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা’কে বাদ দেয়ার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করতো।

আওয়ামী লীগ ২১ বছর পর আবার ক্ষমতায় আসে ১৯৯৬ সালে ৩০০ আসনের মধ্যে মাত্র ১৪৬ টি পেয়ে। ব্রুট মেজরিটি না থাকলেও দলটি রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর নির্যাতন, ব্যক্তিকরণ ও দলীয়করণের ক্ষেত্রে শেখ মুজিবের পথই অনুসরণ করে।

১. ক্ষমতায় বসার সাথে সাথে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে মুজিব ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে নামকরণের হিড়িক পড়ে যায়। শেখ মুজিবের নামের পুর্বে শুধু বঙ্গবন্ধু বলায় (ভুল করে জাতির পিতা না বলায়) একনেকের সভায় একজন সচিবকে পর্যন্ত অপমান করা হয় এবং তাকে পানিশমেন্ট পোস্টিং দেয়া হয়।

২. জননিরাপত্তা আইন পাশ করে বিরোধী দলের কয়েক লক্ষ নেতা-কর্মীদেরকে জেলে পাঠানো হয়। ক্ষমতার শেষ পর্যায়ে বিরোধী দলগুলোর প্রথম সারির নেতাদেরকেও জেলে পাঠানো হয়।

৩. আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্য আদেশে রাজনৈতিক বিরোধীদের উপর হত্যাকান্ড ও নির্যাতন চালায়। রাজধানীতে প্রকাশ্য দিবালোকে কেন্দ্রীয় নেতাদের মিছিল থেকে গুলি চালানো হয় বিএনপি কর্মীদেরকে লক্ষ্য করে। পত্র-পত্রিকায় তার ছবিও ছাপা হয়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বীর গুলিতে সরকারী ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন ছাত্র নিহত হলে প্রধানমন্ত্রী তার ছাত্রকর্মীদেরকে প্রতিষোধ না নেয়ার জন্য এই বলে ভৎর্সনা করেছিলেন যে, তারা কি হাতে চুরি পরে থাকে। কুখ্যাত সন্ত্রাসী জয়নাল হাজারীকে তিনি প্রকাশ্যে সমর্থন দিয়ে এসেছিলেন।

৪. শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবন গণভবনকে নিজের নামে লিখে নেন এবং যতদিন রাজনীতি করবেন, ততোদিন সেখানে অবস্থানের ঘোষণা দেন।

২০০১ সালে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি আবারও সংসদে দুই তৃতীয়াংশের বেশী আসন লাভ করে। লক্ষ্যণীয় যে, এই ধরণের ব্রুট মেজরিটি নিয়েও দলটি নিবর্তনমূলক বা গণতান্ত্রিক অধিকার খর্বকারী কোন আইন পাশ করেনি। এমনকি তৎকালীন বিরোধী দলের সহিংস আন্দোলন দমনেও যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দেয়া হয়।

দেখা যাচ্ছে, বিএনপি ব্রুট মেজরিটির অপব্যবহার না করলেও আওয়ামী লীগের হাতে তা যারপরনাই ক্ষতিকর ও আশংকাজনক। এ ধরণের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে আওয়ামী লীগ করতে পারে না এমন কাজ নেই। এর কারণ দলটির অন্ধভক্ত কর্মী, সমর্থক ও মিডিয়া এবং পশ্চিমা দেশগুলোর সমর্থন। আওয়ামী লীগ যাই করুক না কেন, দলটির কর্মী-সমর্থকেরা তাকে সঠিক ধরে নেয় এবং তার পক্ষে অনঢ় অবস্থান নিয়ে থাকে। বামপন্থা প্রভাবিত মিডিয়াও একই ভূমিকা পালন করে। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে ইসলামভীতি বৃদ্ধি এবং বিএনপির ইসলামপ্রীতির কারণে তারাও ক্ষেত্র বিশেষে দলটির কর্মী-সমর্থকের ভূমিকা নিয়ে থাকে। ফলে দলটি সহজেই বেপরোয়া হয়ে ওঠে। অপর দিকে বিএনপিতে বামপন্থী, ডানপন্থী সকল মতাদর্শের নেতা-কর্মীরাই রয়েছে। ফলে দলটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকে। তাছাড়া মিডিয়ার প্রবল বিরোধিতার কারণে দলটি কোন ভুল বা অন্যায় করলে তা বহুগুণে বর্ধিত হয়ে প্রচারিত হয়। তাতে দলের ক্ষতি হলেও দেশের জন্য ক্ষতিকর কোন পদক্ষেপ নেয়াটা অনেকটাই অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এখন দেখা যাক, আগামীতে ব্রুট মেজরিটি পেলে আওয়ামী লীগ কি করতে পারেঃ

১. শেখ হাসিনার প্রথম রাগটি গিয়ে পড়বে সেনা বাহিনীর উপর। দলটি শুরু থেকেই একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনীর বিপক্ষে। বলা হয়ে থাকে, অতিমাত্রায় ভারতপ্রীতি ও নির্ভরশীলতার কারণে দলটি সেনাবাহিনীকে ভয়, অবিশ্বাস ও অপছন্দ করে থাকে। একটু চিন্তা করে দেখলেই বিষয়টির যৌক্তিকতা বোঝা যাবে। যে কোন দেশে সেনাবাহিনীর মূল প্রয়োজন হচ্ছে বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই সম্ভাব্য বহিঃশক্তিটি কে? প্রধানতঃ ভারত। শেখ মুজিবের শাসনামলে সেনাবাহিনীর বিকল্প তৈরী করা হয়েছিল রক্ষী বাহিনী নামে যার ট্রেনিং দেয়া হয়েছিল ইন্ডিয়ায়, এমনকি এ বাহিনীর সদস্যদের ইউনিফর্মও ছিল ইন্ডিয়ান আর্মির মত। বাংলাদেশের জন্য কোন সেনাবাহিনী প্রয়োজন নেই - এ কথা দলটির থিংক ট্যাংক এতোদিন প্রকাশ্যেই বলে আসছিল। শেখ মুজিবের হত্যার জন্য দলটি প্রকাশ্যই সেনাবাহিনীকে দায়ী করে থাকে।

২. দ্বিতীয় বলি হবে জিয়া পরিবার। জিয়া পরিবারের প্রতি আওয়ামী লীগ, বিশেষ করে দলটির নেত্রীর আক্রোশ গোপন নয়। এর কারণও রয়েছে। দলটির নেতৃবৃন্দ নিজেরাও ভুলতে পারেন না এবং জাতিকেও ভুলাতে পারেন না যে, প্রধানমন্ত্রীত্বের জন্য দরকষাকষি করতে মুজিব যখন স্বেচ্ছাবন্দীত্ব নিয়ে পাকিস্তানে চলে গেলেন, তখন অখ্যাত জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে সব হিসাব নিকাশ পাল্টে দিয়েছিলেন; স্বাধীন বাংলাদেশে যে গণতন্ত্র ও মত প্রকাশের অধিকারকে মুজিব কেড়ে নিয়েছিলেন, সৈনিক হয়েও জিয়া তা জাতিকে ফেরত এনে দিয়েছিলেন; মুজিবের সৃষ্টি তলাহীন ঝুড়ি ও পরনির্ভর জাতির কলঙ্ক ঘুচিয়ে তিনি বাংলাদেশকে দিয়েছিলেন সমৃদ্ধি ও জাতীয় গৌরবের স্বাদ। তারা ভুলতে পারনে না যে, জিয়ার ডিগ্রীহীন, স্বল্পবাক সহধর্মীনির কারণে বহু হিসাব-নিকাশ, পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রের পরও রাষ্ট্রক্ষমতার কাছে পৌছার সৌভাগ্য তাদের খুব কমই হয়েছে। দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে ক্ষমতায় গেলে জিয়া পরিবারকে ধবংস করার ক্ষেত্রে দলটি সময় অপচয় করবে না।

৩. গ্যাস, করিডোর,ট্রানজিট ইত্যাদি ইন্ডিয়ান দাবীগুলো মেনে নেয়ার ক্ষেত্রেও বিলম্ব করা হবে না।

৪. সম্প্রতি ‘ইউনাইটেড স্টেটস অব ইন্ডিয়া’ গঠনের ইন্ডিয়ান পরিকরল্পনার কথা বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রসমূহের মানচিত্র পরিবর্তনের আমেরিকান পরিকল্পনার সাথে তার সামঞ্জস্য রয়েছে। বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করে, জঙ্গীবাদের বিস্তার ঘটিয়ে এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করা অসম্ভব নয়, যেখানে ইন্ডিয়া বাংলাদেশে সামরিক আগ্রাসন চালাতে পারবে। বর্তমানে বিভিন্ন ছুতোয় অন্যের দেশে সামরিক আগ্রাসন চালানোর নজির তো আমেরিকা একের পর এর স্থাপন করে যাচ্ছে। এমনকি সিকিমের উদাহরণ অনুসরণও করা হতে পারে।

তবে, এসবই হচ্ছে হিসাব-নিকাশের কথা। প্রেম আর বিদ্রোহে পাগল বাংলাদেশীরা হিসাব করে পা ফেলে না। এখানে রাজনৈতিক ও প্রেম বিষয়ক সিদ্ধান্ত নেবার সময় মাথার থেকে হৃদয় বেশী প্রভাব বিস্তার করে এবং হৃদয়ের সিদ্ধান্তই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। হিসাব-নিকাশ করে বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন স্বাধীনতার ঘোষণা না দিয়ে পাকিস্তানের কারাগারে যাবার। সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন একজন হিসেবী ব্যারিস্টারকে। ভেবেছিলেন, অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন তিনি। হতবিহ্বল ও নেতৃত্বহীন জাতিকে পথ দেখাতে এগিয়ে এসেছিলেন এক ‘অখ্যাত মেজর’। এ জাতি সেই বেহিসেবী ভালোবাসার মূল্যায়ন করতে যে ভুল করেনি, তার প্রমাণ তাঁর জানাজা। এখনও তিনি তারুণ্য, বীরত্ব ও দেশপ্রেমের প্রতীক হয়ে রয়েছেন। হিসেব-নিকেশ করে শেখ হাসিনা ১৯৮৬ সালে জাতির সাথে বেঈমানী করে স্বৈরাচারকে বৈধতা দিতে নির্বাচনে গিয়েছিলেন। বেহিসেবী সাহস আর দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন খালেদা জিয়া। তার ফলও কারও অজানা নয়। অনেক হিসেব-নিকেশ চলছে। তার কিছু পরিণতি তো মান্নান ভূইয়াদের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে। এমনকি শেখ হাসিনাও কিছু দেখেছেন। মুজিব-জিয়া নেই, কিন্তু তাঁদের উত্তরাধিকার হিসাবে রয়েছেন দুই নেত্রী। রয়েছেন সেই হিসেবী ব্যরিস্টারও। একাত্তর এবং নব্বই এর মত এবারও যে সব হিসেব-নিকেশ পাল্টে যাবে না, তা কে বলতে পারে।